গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | ১৪ - ২০ মার্চ ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের রূপকার মহান স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে শ্রদ্ধা

দলের শিবপুর সেন্টারে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ৫ মার্চ

মারতে পারো কিন্তু পরাস্ত করতে পারবে না

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ৩ মার্চ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল এআইডিএসও। স্কুল এবং সমস্ত ক্ষেত্রের পরীক্ষা ছিল ধর্মঘটের আওতার বাইরে। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের আশেপাশে কোথাও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষার সেন্টার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গেট অন্য দিন বন্ধ থাকলেও সে দিন ছিল একেবারে হাট করে খোলা। সামনে মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী। সঙ্গে মহিলা কম্যান্ডো বাহিনী। এআইডিএসও-র ছাত্রছাত্রী স্লোগান দিয়ে গেটের সামনে পৌঁছতেই পুলিশ ও কম্যান্ডোবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ শুরু করে দেয়। টেনে হিঁচড়ে চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলে। এই কাজে পুলিশ বাহিনীকে বিরাট প্রতিরোধের সামনে পড়তে হয়নি। কারণ এক একজন ছাত্র পিছু অন্তত দশজন পুলিশ মোতায়েন ছিল। যে ভিডিও ক্লিপস ও ছবি ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে যে কেউ এটা বুঝে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি
দুয়ের পাতায়

কলকাতায় এআইডিএসও-র রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিকদের সামনে তাঁদের উপর পুলিশি নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছেন তনুশ্রী বেজ, সুশ্রীতা সরেন, বর্ণালী নায়ক, রানুশ্রী বেজ। ৫ মার্চ

জনরোষ আছড়ে পড়ল মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায়

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় এআইডিএসও কর্মীদের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে ওই থানায় অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির বিক্ষোভ। ৯ মার্চ

মেরুদণ্ড সোজা রেখে পথ হাঁটে সুশ্রীতা সরেন

যে শাসক ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ
সে কি জানে একদিন তারও দিন শেষ হবে!
যে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না,
নীরব কিংবা উদাসীন
সে কি জানে যে কোনও দিন
সে-ও আক্রান্ত হতে পারে!
যে পুলিশ শাসকের তাঁবেদারিতে ব্যস্ত
ন্যায়-অন্যায়ের ফারাক বোঝে না,
লাঠি উঁচিয়ে ছাত্র পেটায়—
সে কি জানে তার নিজ সন্তান
তার কৃতকর্মে লজ্জিত!
যে লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক
শাসকের গোলামি করে
পদ ও প্রাচুর্যের আশায়,
সে কি জানে সকল মেরুদণ্ড বিক্রয়যোগ্য নহে!
যে সমাজ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় পথভ্রষ্ট,
সে কি জানে দাসত্বের মধ্যে কৃতিত্ব নেই, আছে গ্লানি!
যে মেরুদণ্ডী আজ সরীসৃপে পর্যবসিত
সে কি জানে— অনেক অত্যাচারেও
মেরুদণ্ড সোজা রেখে পথ হাঁটে সুশ্রীতা সরেন।

জিশু সামন্ত

যাত্রী আন্দোলনই ভাড়া বৃদ্ধি রুখল

পূর্ব মেদিনীপুরে হলদিয়া পৌর প্রশাসক নন্দীগ্রাম-হলদিয়া ফেরিঘাটে ৪০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির নোটিস দিয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে জোর করে বর্ধিত ভাড়া আদায় করতে থাকে ইজারাদার। এমনকি ফেরিঘাটে গুন্ডা রেখে যাত্রীদের হেনস্থা করে জোর করে বাড়তি ভাড়া আদায় করে। যে নোটিসের মাধ্যমে এই ভাড়া আদায় করছে, তাতে যেমন কোনও মেমো নম্বর নেই, তেমনই স্বাক্ষরও নেই।

এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয়। এই ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহার সহ আনুষঙ্গিক কিছু দাবিতে নন্দীগ্রাম-হলদিয়া ফেরিযাত্রী কমিটি বিক্ষোভ দেখায়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন শ্যামল সাহু, অধ্যাপক বাপ্পাদিত্য গর্গ, মনোজ দাস, বিমল মাইতি, ত্রিনাথ মণ্ডল, যুবরাজ দাস সহ আরও অনেকে। সকাল ৫টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অবরোধ চলার পর জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। হাজার হাজার মানুষের এই প্রতিরোধের চাপে নোটিস দিয়ে আবার পুরানো ভাড়া চালু করতে বাধ্য হয় হলদিয়া পৌর

চারের পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে মামলা

মেদিনীপুর কোতোয়ালি মহিলা থানায় পুলিশি হেফাজতে গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের চার কর্মী সুশ্রীতা সরেন, তনুশ্রী বেজ, রানুশ্রী বেজ, বর্ণালী নায়কের উপর নৃশংস অত্যাচারের বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে ৭ মার্চ। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা ওঠে ১০ মার্চ। বিচারপতি ঘোষ মামলাটি ১১ মার্চ শুনবেন বলে জানান। মামলার মূল পিটিশনার সুশ্রীতা সরেন জানিয়েছেন, জনজাতি পরিচয় উল্লেখ করে তাঁর উপর অত্যাচার ও অবমাননা বিষয়েও তিনি আইনি পদক্ষেপ নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে এআইডিএসও-র খোলা চিঠি

(মেদিনীপুর কোতোয়ালি মহিলা থানায় পুলিশি নির্যাতনের শিকার তনুশ্রী বেজ, সুশ্রীতা সরেন, বর্ণালী নায়ক ও রানুশ্রী বেজ ৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকে এই খোলা চিঠি দেন)

আমরা জানি আপনি সরকার এবং দলের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকেন। তা সত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে এবং খুবই যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্থায় আপনাকে এই চিঠি লিখছি। সম্ভবত আপনি সংবাদমাধ্যম থেকে আমাদের বক্তব্যের কিছু অংশ শুনে থাকবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার জ্ঞাতার্থে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা জানাতে চাই।

আমরা শুনেছি, আপনি যখন যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্রী ছিলেন, তখন সেই কলেজে এআইডিএসও পরিচালিত ছাত্রী ইউনিয়ন ছিল। স্বভাবতই এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদের সংগঠনকে জানার সুযোগ আপনার হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই আপনার আছে যে, আমরা যখন কোনও ছাত্র ধর্মঘট বা আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করি তখন তা কখনওই বোমা, পিস্তল, ছুরি কিংবা লাঠিসোটা নিয়ে তা কার্যকর করার চেষ্টা করি না। এটা এআইডিএসও-র সংস্কৃতি নয়। আমাদের সংগঠনের আদর্শ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতেই ৩ মার্চের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মঘটের (স্কুলস্তরের পঠন পাঠন, পরীক্ষা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষা এই ধর্মঘটের আওতার বাইরে ছিল) আবেদন জানাতে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় গেটে পৌঁছনো মাত্রই বিশাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আচমকা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। গ্রেপ্তার চলাকালীন মহিলা সংগঠকদের উপর পুরুষ পুলিশকর্মীরা অশালীন আচরণ করে। আমাদের মধ্যে একজন, রানুশ্রী বেজ পুলিশি নিগ্রহে গুরুতর আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর জলের জন্য আর্তনাদ করতে থাকলে পুলিশ জল না দিয়ে পুনরায় থাপ্পড় মারে ও নানা ভাবে আঘাত করে। এরপরও যে আমাদের জন্য আরও বীভৎস অত্যাচার অপেক্ষা করছিল, আমরা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে, ক্যাম্পাসে থ্রেট সিন্ডিকেট ও মেদিনীপুরে এআইডিএসও কর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ৬ মার্চ সংগঠনের ডাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিযানে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। উপাচার্যকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আহত অবস্থাতে গ্রেফতারের পর আমরা বারবার চাইলেও আমাদের কোনও চিকিৎসা করানো হয়নি। আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মহিলা কোতোয়ালি থানায়। সেখানে আমাদের সাথে যে পাশবিক ও বর্বরোচিত আচরণ করা হয়, অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা হয়, তা এই সভ্য সমাজে ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য। আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার আড়ালে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করা হয়। লকআপের ভিতর অ্যারেস্ট মেমোতে সই করানোর সময় আমাদের হাতে এবং পায়ে জ্বলন্ত মোমবাতির মোম গলিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের শরীরের উপর চারজন পুলিশকর্মীকে দাঁড় করিয়ে ওসি নিজের বেল্ট খুলে পেটায়, বর্ণালী নায়েকের মুখে ভারী বুট দিয়ে আঘাত করতে থাকে। মুখগহ্বরের ভেতর রক্ত ঝরতে থাকলে মুখে জল ঢেলে সেই জল খেতে বাধ্য করা হয়। চুলের মুঠি ধরে শূন্যে উঁচু করে ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের তলায় আঘাত করতে থাকে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে থানার ওসি 'মেরে জোশ আসছে না' বলে মানসিক বিকারগ্রস্তের মতো চটুল বলিউডি গান চালিয়ে গানের তালে তালে অত্যাচার চালাতে থাকে ও পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। আমাদের মধ্যে একজন সুশ্রীতা সরেনের আদিবাসী জনজাতি পরিচয়কে অত্যন্ত কুৎসিত ইঙ্গিত করে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করতে করতেই ওসি আক্রমণ চালাতে থাকে এবং নানা মিথ্যা ও অনৈতিক মুচলেকা নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে আমাদের সংগঠনের কোন কোন কর্মীর উপর তারা এই ধরনের অত্যাচার চালাবে তার আগাম ঘোষণা দিতে থাকে। সরাসরি গুম ও খুনের হুমকি দেয়। আমাদের উপর অত্যাচারের চিহ্ন লোপাট করবার জন্য আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ধ্যায় স্নান করানো হয়। জানানো হয় আমাদের ছাড়া হবে না। এটা জেনে আমাদের অভিভাবকরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর, আচমকা রাত ২টা নাগাদ অন্ধকার, জনমানবহীন, যানবাহনহীন রাস্তায় আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আমাদের সাথে কী ঘটতে পারত, এ কথা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা শুনেছি, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পুলিশের দ্বারা আপনি কী ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। আপনার শাসনকালে পুলিশের এই আচরণ আমাদের সেই ঘটনাকেই স্মরণ করাল। আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন— প্রথমত, যেখানে খুনের আসামীকেও পুলিশি হেফাজতে আইনত অত্যাচার করা চলে না, সেখানে কেবল গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি বলে আমাদের উপর এই অত্যাচার কি আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত? দ্বিতীয়ত, আইন শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার প্রহরী বলে যাদের দাবি করা হয়, তাদের কাছে নাগরিকদের বিশেষত নারীদের নিরাপত্তা কতটুকু সুরক্ষিত? তৃতীয়ত, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের যখন এই নৃশংসতার ঘটনায় অনুতাপ প্রকাশ করা ও তদন্ত করার প্রয়োজন ছিল, তখন তিনি সমস্ত ঘটনাকে বেমালুম অস্বীকার করেছেন এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। এতেও কি প্রমাণ হয় না যে— তিনি সমস্ত ঘটনা জানতেন এবং তার সম্মতিতেই এই বর্বরোচিত অত্যাচার ঘটেছে?

নারকীয় ঘটনার যতটুকু সভ্য সমাজে প্রকাশ্যে আনা যায়, খুবই সংক্ষিপ্তভাবে তা আপনাকে জানালাম। আশা করি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং একজন নারী হিসেবে এই ভয়াবহ অত্যাচারের তাৎপর্য অনুধাবন করে অপরাধীদের যথাযোগ্য বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরাস্ত করতে পারবে না

একের পাতার পর

নিতে পারবেন। মহিলা কম্যান্ডো বাহিনী ছাত্রীদের পিঠে বুটের লাথি, চুলের মুঠি ধরে টানাটানি ও হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশি নির্যাতনে অজ্ঞান হয়ে পড়া এক ছাত্রীকে তাঁর সহকর্মী জল দেওয়ার জন্য আবেদন করলেও তাতে কর্ণপাত করা দূরের কথা, উল্টে আঘাত করেছে পুলিশ। ধর্মঘটের দিন এই ছিল পুলিশের ভূমিকা।

এরপর পুলিশ লকআপে ছাত্রীদের উপরে যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা এতই বর্বরোচিত যে, পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচারের কথা মনে করায়। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেওয়া মেয়েদের উপর থানার মধ্যে এ রকম অত্যাচারের নজির কোনও সভ্য দেশে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তনুশ্রী বেজ, সুশ্রীতা সরেন, রানুশ্রী বেজ, বর্ণালী নায়ক এই চারজন ছাত্রীকর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে তুলে আনার পর, থানায় সিসি ক্যামেরার আওতার বাইরে একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুরু হয় নির্যাতন। উল্লেখ্য, তনুশ্রী বেজ এআইডিএসও-র পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদিকা ও সুশ্রীতা সরেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। মহিলা থানার ওসি স্বয়ং কোমরের বেল্ট খুলে মারা, চুলের মুঠি ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে বেত মারা, উত্তপ্ত গলিত মোম গায়ে ঢেলে দেওয়া, মেঝেতে ফেলে পায়ের উপর দু-তিন জন দাঁড়িয়ে এমন জায়গায় আঘাত করা যাতে বাইরে থেকে টের না পাওয়া যায়—এই ধরনের পাশবিক অত্যাচারে হাত লাগান। এত করেও নাকি তাঁর মারার 'জোশ' আসছিল না! ধর্ষকামী উল্লাসের তখনও আরও কিছু বাকি। সুশ্রীতা সরেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের শুনে ওসির রক্ত আরও গরম হয়ে ওঠে। থানার মধ্যে মেরে পুঁতে ফেলার হুমকি দিয়েও যখন কাজ হয় না, উচ্চস্বরে বলিউডি মিউজিক চালিয়ে উল্লাস প্রদর্শন করতে করতে, মুড চাঙ্গা করে আবার আসরে নেমে পড়েন। এ সব কুকীর্তি যাতে প্রকাশ না পায়, জোর করে স্নান করিয়ে কীর্তির দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। তারপর রাত দুটোয় যানবাহনহীন শুনশান রাস্তায় এই ছাত্রীদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

পরের দিন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করা হয়। এই সব কিছু থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুলিশ, প্রশাসন, দুর্নীতির কারবারিদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও গভীর বোঝাপড়া। আর জি কর থেকে মেদিনীপুর হাসপাতালের স্যালাইন কাণ্ড কিংবা যাদবপুর— ঘটনা আলাদা আলাদা, কিন্তু যোগসূত্র একই। দুর্নীতি, থ্রেট কালচার, দাদাদের দাপাদাপি, গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরা, প্রতিবাদ করলে চূড়ান্ত হয়রানি এমনকি জীবন সংশয়। দুর্নীতি ঢাকতে সহকারী ভূমিকায় কে? পুলিশ, প্রশাসন, আমলা-মন্ত্রীরা। প্রতিবাদী স্বরকে দমাবে কারা? এরাই। গুন্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে কারা? এরাই। শাসকের পায়ের কাছে সমস্ত মানবিকতার জলাঞ্জলি দিয়ে এরা নোকরি করে ক্রীতদাসের মতো। গোলামিই যাদের জীবন, গোলামিতেই তাদের শেষ। এই মেদিনীপুরের মাটিতেই তো ক্ষুদিরাম জন্মেছিলেন। একশো বছর পরেও যাঁকে স্মরণ করে এগিয়ে চলেছে ছাত্র-যুবরা। এই মাটিতেই তো বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত, শহিদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন। অসংখ্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান এই মেদিনীপুর। তাঁদের অনুসারী ছাত্রীরা তো প্রীতিলতাদের আকাঙ্ক্ষায় বেড়ে উঠবেই। তারা শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলবেই। শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়, তাঁর গাড়ি যদি ছাত্রদের দাবি না মেনে, বেপরোয়া হয়ে ছাত্র পিষ্ট করে চলে যায়, তারা প্রশ্ন তুলবেই। নিশ্চেষ্ট না থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধে শামিল হবে। প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার ধর্মঘটে তারা শামিল হবেই।

শিক্ষাঙ্গনের যিনি অভিভাবক, ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ, দাবি, অধিকার কীভাবে মেটাবেন সে আলাদা কথা, কিংবা আদৌ তাঁর সে ক্ষমতা বা এক্তিয়ার আছে কি না, নাকি তিনি ঠুঁটো জগন্নাথ, তার হাত পা বাঁধা সে সব পরের কথা। কিন্তু সর্বাগ্রে সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক হওয়ার কথা তো তাঁর! ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে তাঁর এই ভাবে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে দেওয়া, সমস্যা সমাধানের কোনও চেষ্টা না করে পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তোলার দায় তিনি কোনও ভাবে এড়াতে পারেন না।

শিক্ষার মতো এমন একটি গুরুদায়িত্বে থেকে, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়, সে ক্ষেত্রে তিনি কতটা দায়িত্বশীল? শিক্ষাঙ্গনে দিনের পর দিন চলা নৈরাজ্য থামাতে তিনি আজ পর্যন্ত সত্যিই কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করেছেন নাকি কেবল একজন সার্থক দলদাসের ভূমিকা পালন করে চলেছেন? দিনের পর দিন চলা এ হেন পরিস্থিতির প্রতিকার ছাত্রসমাজ চাইবেই!

কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শিক্ষা

(বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির পথপ্রদর্শক, মহান নেতা কার্ল মার্ক্সের জীবনাবসান ঘটে ১৮৮৩-র ১৪ মার্চ। এই দিনটি আমরা মার্ক্স স্মরণ দিবস হিসেবে উদযাপন করি তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষাগুলিকে বিশেষভাবে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্যেই এ বার মার্ক্সের ১৪৩তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হল।)

বুর্জোয়া বনাম প্রলেতারিয়েত

"এ পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত সমাজের ইতিহাস (অর্থাৎ সমস্ত লিখিত ইতিহাস) হল শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাধীন নাগরিক আর দাস, প্যাট্রিশিয়ান আর প্লিবিয়ান, সামন্তপ্রভু আর ভূমিদাস, গিল্ড-কর্তা আর জার্নিম্যান, এক কথায় অত্যাচারী আর অত্যাচারিতরা সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা গোপনে বিরামহীন লড়াই চালিয়েছে, আর সে লড়াই প্রতিবারই শেষ হয়েছে হয় গোটা সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে, নয় তো দ্বন্দ্বরত শ্রেণিগুলির সকলের ধ্বংসের মধ্যে।

ইতিহাসের গোড়ার যুগে আমরা সর্বত্রই প্রায় দেখতে পাই সমাজের একটা জটিল ধরনের বিন্যাস, যাতে ছিল বিভিন্ন বর্গ, ছিল সামাজিক পদ-মর্যাদার নানান ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, নাইট, প্লিবিয়ান আর দাসেরা। মধ্যযুগে ছিল সামন্তপ্রভু, উপ-সামন্ত, গিল্ডকর্তা, জার্নিম্যান, শিক্ষার্থী আর ভূমিদাসরা। এই সমস্ত শ্রেণির প্রায় প্রত্যেকটার মধ্যেই আবার ছিল নানা উপস্তরের ধাপ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ শ্রেণি-শত্রুতার অবসান ঘটায়নি। এ শুধু সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন শ্রেণি, অত্যাচারের নতুন নতুন অবস্থা, পুরনোর বদলে নতুন নতুন ধরনের সংগ্রাম।

আমাদের যুগ— অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে— এটা শ্রেণি-শত্রুতাকে সরল করে দিয়েছে। গোটা সমাজ উত্তরোত্তর ভাগ হয়ে পড়ছে সরাসরি পরস্পর সম্মুখীন দুটো বিশাল শত্রুশিবিরে— বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত। ...

উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে (ইনস্ট্রুমেন্টস) অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে আর তার ফলে উৎপাদন সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে সমাজের গোটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি টিকে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, অতীতে শিল্পক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণির টিকে থাকার প্রথম শর্তই ছিল, পুরনো উৎপাদন পদ্ধতিকে অপরিবর্তিত রূপে জিইয়ে রাখা। আগের সমস্ত যুগের সঙ্গে বুর্জোয়া যুগের পার্থক্য এই যে, এ যুগে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কে অনবরত রদবদল ঘটছে, অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনা এ যুগে হয়েছে চিরস্থায়ী। সমস্ত অনড়, জমাট-বাঁধা সম্পর্ক আর তার আনুষঙ্গিক সনাতন, শ্রদ্ধামণ্ডিত কুসংস্কার আর মতামত পাকাপোক্ত ভাবে দানা বাঁধার আগেই সেকেলে, অচল হয়ে পড়ছে। যা কিছু পাকাপোক্ত তা-ই মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে, যা কিছু পূতপবিত্র তা-ই হয়ে পড়ছে অশ্রদ্ধার বস্তু, অবশেষে মানুষ বাধ্য হচ্ছে তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সাদা চোখে দেখতে।

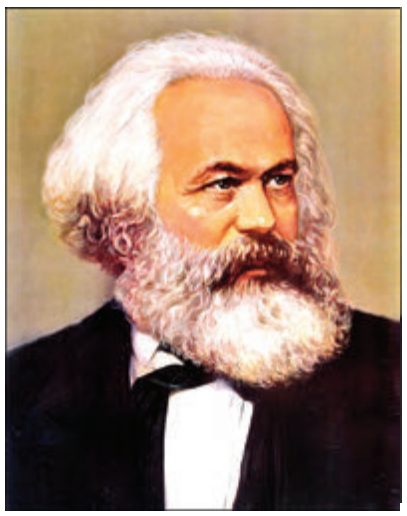

৫ মে ১৮১৮ - ১৪ মার্চ ১৮৮৩

নিজেদের তৈরি মালের অবিরাম ক্রমবর্ধমান বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। সর্বত্র এদের ঢুঁ মারতে হচ্ছে, সর্বত্র গিয়ে শেকড় গেড়ে বসতে হচ্ছে, সর্বত্র স্থাপন করতে হচ্ছে যোগসূত্র।

বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি প্রত্যেক দেশে উৎপাদন আর ভোগকে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দিয়েছে। যে জাতীয় ভিত্তিভূমির ওপর শিল্প দাঁড়িয়ে ছিল সেই ভিত্তিভূমি শিল্পের পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে এরা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে প্রতিক্রিয়াশীলদের। সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্পকে এরা হয় ধ্বংস করেছে, নয়ত সেগুলি প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ওই সব শিল্পকে স্থানচ্যুত করছে এমন সব নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সমস্ত সভ্য জাতির পক্ষেই হয়ে দাঁড়িয়েছে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। সে সব শিল্পে আর দেশজ কাঁচামালে কাজ চলে না, চলে দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে। সে সব শিল্পে উৎপন্ন জিনিস শুধু মাত্র স্বদেশেই নয়, দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। দেশের মধ্যে তৈরি উৎপাদনে যে সব চাহিদা মিটত সেইসব পুরনো চাহিদার বদলে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাবার জন্যে দরকার হয় দূর দূর দেশ আর আবহাওয়া থেকে আনা উৎপন্ন দ্রব্য। আগেকার স্থানীয় আর জাতীয় বিচ্ছিন্নতা আর আত্মনির্ভরতার জায়গায় দেখা দিয়েছে সর্বব্যাপী আদান-প্রদান, জাতি সমূহের বিশ্বব্যাপী পরস্পর নির্ভরতা। যেমন বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ঠিক তেমন ব্যাপারই ঘটেছে মানসিক-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। এক একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি পরিণত হচ্ছে সকলের সম্পত্তিতে। জাতিগত একদেশদর্শিতা আর সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমশ আরও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অসংখ্য জাতীয় আর স্থানীয় সাহিত্য থেকে জন্ম নিচ্ছে বিশ্বসাহিত্য।

উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রপাতিতে দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিকাশসাধন করে বুর্জোয়া শ্রেণি সমস্ত জাতিকে, এমনকি সব চেয়ে বর্বর জাতিকেও সভ্যতার স্তরে টেনে আনছে। যে ভারী কামান দেগে তারা সমস্ত চৈনিক প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, বর্বর জাতিদের তীব্র বিজাতি-বিদ্বেষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করছে তা হল তাদের উৎপন্ন পণ্যের সস্তা দর। সমস্ত জাতিকে এরা বাধ্য করছে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে। অন্যথা তাদের অবলুপ্তির আশঙ্কা থাকে। এরা যাকে বলে সভ্যতা— তা গ্রহণ করতে সমস্ত জাতিকে বাধ্য করছে, অর্থাৎ বাধ্য করছে তাদেরও বুর্জোয়া বনতে। এক কথায় বলা যায় এরা নিজেদের ছাঁচে দুনিয়াকে ঢেলে সাজাচ্ছে।

বুর্জোয়া শ্রেণি গ্রামকে শহরের কর্তৃত্বাধীনে এনেছে। এরা সৃষ্টি করেছে বিরাট বড় বড় শহর। গ্রামের জনসংখ্যার তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বিপুল ভাবে বাড়িয়েছে আর এইভাবে জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে উদ্ধার করেছে গ্রাম্যজীবনের মূঢ়তা থেকে। এরা যেমন গ্রামকে শহরের ওপর নির্ভরশীল করেছে তেমনি বর্বর আর আধা-বর্বর দেশকে সভ্য দেশের ওপর, কৃষক-প্রধান জাতিকে বুর্জোয়া-প্রধান জাতির ওপর, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল করেছে।

জনসমষ্টি, উৎপাদনের উপাদান আর সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণি উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে ঘুচিয়ে দেয়। এরা জনসমষ্টিকে পুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপাদানকে কেন্দ্রীভূত করেছে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি জড়ো করেছে। এর অনিবার্য ফল হিসাবে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। এর ফলে পৃথক স্বার্থ, পৃথক আইনকানুন, পৃথক সরকার এবং পৃথক কর ব্যবস্থা সম্বলিত স্বাধীন বা শিথিল ভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলি মিলে মিশে গিয়ে একই সরকার, একই জাতীয় শ্রেণিস্বার্থ, একই সীমান্ত এবং একই বহিঃশুল্ক ব্যবস্থা সম্বলিত একটা জাতিতে পরিণত হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্যের বয়স একশো বছরও এখনও পূর্ণ হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই তারা উত্তরোত্তর এমন বিপুল এবং অতিকায় উৎপাদনশক্তি সৃষ্টি করেছে যা আগেকার সমস্ত যুগের মিলিত উৎপাদনশক্তির চেয়েও অনেক বেশি। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের আর যন্ত্রপাতির বশে আনা, শিল্প আর কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পীয় নৌ-চলাচল ব্যবস্থা, রেলওয়ে ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রবর্তন, এক একটা গোটা মহাদেশ চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলা, নদীর গতি পরিবর্তন করা, মাটি ফুঁড়ে ভেলকিবাজির মতো জনসমষ্টির আবির্ভাব ঘটানো— সামাজিক শ্রমের কোলে যে এমন উৎপাদনশক্তি ঘুমিয়ে আছে এ কথা অতীতের কোনও শতাব্দী কি ভাবতে পর্যন্ত পেরেছিল?

তাই আমরা দেখছি, যে উৎপাদন আর বিনিময়ের উপকরণের বনিয়াদের উপর বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেকে গড়ে তুলেছিল, তার উৎপত্তি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। উৎপাদন আর বিনিময়ের এই সমস্ত উপকরণ বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে, যে নিয়মে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন ও বিনিময় হত, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প আর কৃষির যে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন— এক কথায় সম্পত্তির যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা ইতিমধ্যে বিকশিত উৎপাদনশক্তির সঙ্গে আর খাপ খাচ্ছিল না। সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল শৃঙ্খল বিশেষ। সে-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার দরকার হয়ে পড়ল। সে-শৃঙ্খল টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হল। তাদের জায়গায় আবির্ভাব ঘটল অবাধ প্রতিযোগিতার। আর সেই সঙ্গে এল তাদের উপযোগী সামাজিক আর রাজনৈতিক বিধি-বিধান এবং বুর্জোয়া শ্রেণির অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

আজ আমাদের চোখের সামনে অনুরূপ একটা বিকাশধারা চলেছে। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ নিজের উৎপাদন, বিনিময় আর সম্পত্তি-সম্পর্কের ভিত্তিতে ভোজবাজির মতো এক বিপুল উৎপাদন আর বিনিময়ের উপাদান গড়ে তুলেছে— কিন্তু এ সমাজের অবস্থা সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলে সেগুলি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরে শিল্প আর বাণিজ্যের ইতিহাস হল আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস, বুর্জোয়া শ্রেণি আর তার আধিপত্যের শর্ত যে সম্পত্তি-সম্পর্ক, তার বিরুদ্ধে উৎপাদনশক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে সব বাণিজ্য-সংকট পালা করে বারে বারে এসে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে বিপন্ন করে তোলে তার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এইসব সংকটের সময় বর্তমান উৎপন্ন দ্রব্যের একটা বড় অংশই শুধু নয়, অতীতে সৃষ্ট উৎপাদন শক্তিসমূহের বড় অংশও বারে বারে ধ্বংস হয়ে যায়। এই সব সংকটের সময় একটা মহামারী দেখা যায় যা অতীতের যুগে অসম্ভব কাণ্ড বলে মনে হত তা হল অতি উৎপাদনের মহামারী। সমাজ যেন অকস্মাৎ ফিরে যায় একটা সাময়িক বর্বরতার মধ্যে। মনে হয় যেন একটা দুর্ভিক্ষ, একটা সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুর জোগান বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রমশিল্প আর বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কারণ সভ্যতা গড়ে উঠেছে বড় বেশি, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত, শিল্প সৃষ্টি হয়েছে অত্যধিক, বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে অতিমাত্রায়। সমাজের হাতে যে উৎপাদনশক্তি রয়েছে তা বুর্জোয়া সম্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার আর বিকাশ সাধন করতে পারছে না। পক্ষান্তরে, সেগুলি এই অবস্থার পক্ষে অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এই অবস্থার দ্বারা শৃঙ্খলিত হচ্ছে, আর যখনই সেই শৃঙ্খল তারা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে তখনই গোটা বুর্জোয়া সমাজে তারা আনছে বিশৃঙ্খলা, বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। বুর্জোয়া সমাজের পরিবেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগানোর পক্ষে ওই পরিবেশ অতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

দুরগ, ছত্তিশগড়

আগরতলা, ত্রিপুরা

যাদবপুর, কলকাতা

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় এআইডিএসও কর্মীদের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদ দেশ জুড়ে

সরকারি কর্মচারীদের অবস্থানে বিপুল সাড়া

সরকারি কর্মচারীদের ২১টি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ১ মার্চ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকারের ঘোষিত মাত্র ৪ শতাংশ ডি এ নয়, অবিলম্বে এআইসিপিআই অনুযায়ী বকেয়া সহ ৩৯ শতাংশ ডিএ দেওয়া, অবিলম্বে সপ্তম পে কমিশনের ঘোষণা, সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্থায়ীকরণ প্রভৃতি। এই সব দাবিতে এ দিন বিদ্যাসাগর মূর্তির কাছে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সরকারি, আধা সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, শিক্ষাকর্মী, পেনশনাররা উপস্থিত ছিলেন। বেলা ২ টো থেকে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ অবস্থানে দলে দলে কর্মচারী শিক্ষক পেনশনারদের যোগ দিতে দেখা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কনফেডারেশন অফ স্টেট গর্ভনমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, নার্সেস ইউনিটি, আয়ুষ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম সহ ২১টি সংগঠন এই অবস্থানে ছিল।

সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দীনবন্ধু বিদ্যাভূষণ, শুভাশিস দাস, নীলকান্ত ঘোষ, মলয় মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু মুখার্জী, ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভাস্বতী মুখার্জী, দিলীপ মাইতি প্রমুখ।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয় পশ্চিমবাংলার আরও বহু সংগঠন যোগাযোগ করছেন। তাঁরাও এই যুক্ত আন্দোলনে সমবেত হবেন। যতদিন না সরকার দাবি মেনে নিচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।

‘বুঝতে পারলাম প্রকৃত রাজনীতি কাকে বলে’

গত ২১ জানুয়ারি অভয়ার ন্যায়বিচার সহ নানা দাবিতে এসইউসিআই(সি)-র ডাকে কলকাতায় মহামিছিলে যোগ দেওয়া এক ছাত্রের অভিব্যক্তি

আমি সপ্তর্ষি রায়, একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্র। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের মহাতাবপুরে। আমার বাবা একজন প্রাথমিক শিক্ষক। গত ২১ জানুয়ারি একটি নতুন রকমের জগতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমার কেটেছে। আগের দিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি শরীরে জ্বর ছিল। হিরণ্য স্যারকে প্রায় না যাওয়ার সম্ভাবনাই বলেছিলাম। স্যারকে না বলতে পারাটাই হচ্ছে সব থেকে কঠিন কাজ। তাই সব কিছুকে উপেক্ষা করে চললাম কলকাতার উদ্দেশ্যে।

বাসের মধ্যে একজন দিদুনের সাথে পরিচয় হয়েছিল। যাঁর হাত ধরে গোটা মিছিলটাই ঘুরেছি। বাস থেকে নামার সময় পর্যন্ত যাঁর অনুশাসনের মধ্যে ভালোবাসার, আন্তরিকতার সুর খুঁজে পেয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ। যে আন্তরিকতা আমি স্যারের কাছেও পাই। বাস থেকে নামার সময় বুঝতে পারলাম প্রকৃত রাজনীতি কাকে বলে। অন্য কোনও দলের সাথে কোনও দিন মিশিনি, যাইনি। তবে দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, রাজনীতি মানে নেশা, খারাপ কথা, লোক ঠকানো, মারপিট, উল্লাস ও অসামাজিকতা। কিন্তু এদের দেখে এসইউসিআই দলকে একটি ভিন্ন রকমের রাজনৈতিক দল বলে মনে হয়েছে। আমার বাড়ির লোকজনও আমার ছবি ও আমাকে দেখে খুশি।

সব থেকে অবাক লেগেছে এবং এক প্রকার চমকে গিয়েছি স্যারের জোরগলার স্লোগান শুনে। মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতি যে কিছু দায়বদ্ধতা আমারও আছে, মিছিল থেকে ফিরে সেদিন আমার এটাই মনে হয়েছে। আগামী দিনে যতটা সম্ভব আমিও চেষ্টা করব এই রকম কর্মসূচিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন

২৬ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া শহরে ইমন কল্যাণ প্রেক্ষাগৃহে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ১৫০ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি অসীম কুমার ভট্টাচার্য পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত শিক্ষক কার্তিক সাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বাৎসরিক প্রতিবেদনে পাঠ করেন শিক্ষক কনককুমার সরদার।

সম্মেলন জাতীয় শিক্ষানীতি সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষা ধ্বংসকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ, অবসরপ্রাপ্ত জীবনে নানা সমস্যা, মেডিকেল ভাতা বৃদ্ধি, এ আই সি পি আই নিয়ম অনুযায়ী পাওনা ডি এ, পূর্বের ন্যায় রেল কনসেশন প্রদান প্রভৃতি দাবি নিয়ে রাজ্যের অধিকাংশ প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অসীম কুমার ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও কনক কুমার সরদারকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে ডেপুটেশন ফুলচাষিদের

ফুলকে ‘অর্থকরী কৃষিপণ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি, রাজ্যে ফুলের গবেষণাগার নির্মাণ, মল্লিকঘাট ফুলবাজার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠা ফুলবাজারগুলিকে আধুনিক করে গড়ে তোলা, ফুল থেকে উপজাত সামগ্রী তৈরির কারখানা নির্মাণ, ফুল পরিবহণের জন্য রেলে ও বিমানে কোটা পদ্ধতি চালু, পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলাতে অবিলম্বে হর্টিকালচার ক্লাস্টার প্রজেক্ট চালু, ফুলচাষিদের সহজ শর্তে ঋণ ও কৃষিবিমা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি ১০ দফা দাবিতে ৫ মার্চ সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও সদস্য জয়দেব বেরা, শুভাশিস মণ্ডল প্রমুখ।

এ দিন সমিতির পক্ষ থেকে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানকেও স্মারকলিপির কপি দেওয়া হয়।

কর্মবন্ধুদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন

সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার (কর্মবন্ধু) কর্মচারী সমন্বয় সমিতির প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হল বালুরঘাট জেলা সাংবাদিক ভবনে। ৫০ জনের বেশি কর্মবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দাবি— মৃত ও অক্ষম কর্মীর পোষ্যের চাকরি, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান, সমস্ত কর্মবন্ধুকে স্বাস্থ্য বিমা এবং গৃহঋণের আওতায় আনা ও সমস্ত কর্মবন্ধুর গ্রুপ-ডি কর্মচারী স্বীকৃতি।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা। বীরেন মহন্তকে সভাপতি এবং রাজা মহন্তকে সম্পাদক করে মোট ২৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

আন্দোলনই ভাড়া বৃদ্ধি রুখল

একের পাতার পর

কর্তৃপক্ষ। সমন্বয় কমিটির পক্ষে মনোজ দাস সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনের প্রাথমিক দাবি পূরণ হলেও দু’দিকের টিকিট কাউন্টার, ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, সময়সূচির পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।’

কেরালায় আশাকর্মীদের ধর্মঘট বানচাল করার অপচেষ্টা সিটু নেতাদের

সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর কেরালা রাজ্য শাখা আশাকর্মীদের চলমান ধর্মঘটে বেজায় চটেছে। আশাকর্মীরা তাদের ন্যায্য কিছু দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট করে চলেছেন। রাজ্যের সিপিএম সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে সাম্মানিক ভাতা বাড়াতে হবে এবং প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে তা দিতে হবে। অবসরকালীন সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। রয়েছে আরও কিছু অর্থনৈতিক দাবি। সবটাই তাঁরা দাবি করেছেন শ্রমের ন্যায্য পাওনা হিসেবে, কোনও দয়ার দান হিসেবে নয়। কিন্তু রাজ্যের সিপিএম সরকার দাবি মানতে নারাজ। উল্টে তারা ধর্মঘট বানচাল করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চলছে ভয় দেখানো ও হুমকি।

আশাকর্মীরা দেশব্যাপী স্বাস্থ্যব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সরকারই এঁদের নিয়োগপত্র দিয়েছে। কিন্তু সরকারি কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি আজও কেন্দ্রের বা রাজ্যের কোনও সরকারই দেয়নি। বিজেপি, কংগ্রেস পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য স্বার্থরক্ষাকারী দল। তাদের দলের নীতি এবং শাসন পরিচালনা শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থবিরোধী। সে কারণে আশাকর্মীদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করতে, তাদের শ্রম নিংড়ে নিয়ে ভাতা নামের ছিটেফোঁটা ধরিয়ে দিয়ে ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত করতে এদের নৈতিকতায় আটকায় না।

কিন্তু সিপিএম সরকার তো নিজেকে জনগণের সরকার বলে দাবি করে! সিপিএম তো নিজেদের শ্রমিক শ্রেণির দল বলে! তা হলে আশাকর্মীদের অতি সাধারণ কয়েকটি দাবি তারা উপেক্ষা করে কী করে? আর সিটু নেতারা শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের কথা বলতে বলতে আশাকর্মীদের এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কী করে?

সিটুর রাজ্য সম্পাদক ইলামারন করিম ধর্মঘটকে কটাক্ষ করে বলেছেন, এই ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেন তিনি এ কথা বললেন? আসলে আশাকর্মীদের মধ্যে অনেকেই থাকতে পারেন যাঁরা সরাসরি কোনও রাজনীতি করেন না। কিন্তু তাঁরা এটুকু অনুভব করতে পারেন, তাঁদের যে ন্যায্য বেতন দেওয়া হয় না, সেটা সরকারের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাঁদের যে সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না সেটাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সরকার একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাই আশাকর্মীদের এই বঞ্চনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ স্পষ্ট। অথচ এই বঞ্চনার মোকাবিলার সংগ্রামকে শাসকদলের ধুরন্ধর নেতা-মন্ত্রীরা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট আখ্যা দিয়ে অত্যন্ত কৌশলে এই আন্দোলনকে দুর্বল করতে চাইছে। অর্থাৎ আশাকর্মীদের ধর্মঘটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলার পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি। করিম সাহেবের এই ধূর্তামি শ্রমিকরা, আশাকর্মীরা ধরে ফেলেছেন এবং ধর্মঘটে অবিচল রয়েছেন।

এতে ওদের রাগ আরও বেড়েছে। আসরে নেমেছেন সিটুর রাজ্য সহ-সভাপতি হর্ষকুমার। তিনি সমস্ত সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে আশাকর্মীদের তুলনা করেছেন রোগ-জীবাণুবাহক কীটপতঙ্গের সাথে। যে আশাকর্মীরা কোভিড সংক্রমণকালে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে চিকিৎসা পরিষেবায় নিয়োজিত ছিলেন, সরকার যাঁদের ওই আপৎকালীন পরিষেবার জন্য ঘোষিত অনুদানটুকুও ঠিকমতো দেয়নি, তাঁদের এ ভাবে অবজ্ঞা ও হেনস্থা করার মধ্য দিয়ে এই 'শ্রমিক সংগঠনে'র চরিত্রটাই স্পষ্ট হয়ে গেল।

কেন এ ধরনের অবস্থান সিটুর? এর মধ্য দিয়ে ওরা শ্রমিক এবং মালিক উভয়কেই দুটি ভিন্ন বার্তা দিল। মালিককে দিল অভয় বার্তা। শ্রমিককে দিতে চাইল ভয়ের বাতাবরণ। রাজ্যের পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফার স্বার্থে সমস্ত রকম সহযোগিতার উদ্দেশ্যে যে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সরকার নিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে মালিকদের আরও মদত পেতে এই ধরনের শ্রমিক বিরোধী অবস্থানের উদ্যোগ নেয় তারা।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম শাসনের শেষ লগ্নে তাদের মন্ত্রীরা শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ ভাবে প্রকাশ্যেই তাচ্ছিল্যের সাথে কথা বলতেন। এ রাজ্যের মানুষ যে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল তা বিনা কারণে ছিল না। সেই একই দম্ভ আজ কেরালার নেতাদের আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে।

পাটনায় মানবাধিকার শীর্ষক আলোচনা সভা

সরকারই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। শাসকদলই বুলডোজার চালাচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর। বাঁচার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার বিপন্ন। ২ মার্চ পাটনার আইএমএ হলে সিপিডিআরএস আয়োজিত আলোচনাসভায় এই কথাগুলি উঠে এল। সভায় বক্তব্য রাখেন বিহার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিচারপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিহার রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ব্যাসজি, প্রবীণ সাংবাদিক সুরর আহমেদ, পাটনা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট গোপাল কৃষ্ণ, সৈয়দ ফিরোজ রাজা। সংগঠনের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক দ্বারিকানাথ রথ মানবাধিকার রক্ষার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। আন্দোলন সংক্রান্ত ১৮ দফা দাবিসনদ পেশ করেন নিকোলাই শর্মা।

জনবিরোধী কৃষি-আইন ঘুরপথে চালুর প্রতিবাদে এআইকেকেএমএস-এর ডাকে অন্ধ্রপ্রদেশের হিন্দুপুরে কৃষক কনভেনশন। বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। ৩ মার্চ

ট্রেন লেট ও বাতিল এবং বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে অস্বাভাবিক দেরিতে ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে, হঠাৎ ট্রেন বাতিল ও রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, যাত্রীদের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৭ মার্চ এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) -এর পক্ষ থেকে দিল্লিতে রেল ভবনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দপ্তরে ১২ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন মধুসূদন বেরা, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, শান্তি ঘোষ, প্রদীপ দাস, শংকর মালাকার প্রমুখ। দপ্তরের সেকশন অফিসার স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম, রেলের সময়সারণি মেনে সমস্ত ট্রেন চালানো, আগাম ঘোষণা না করে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া হঠাৎ ট্রেন বাতিল বন্ধ, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্রয়োজনীয় চরিত্র না পাল্টে কেবল এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা লাগিয়ে বর্ধিত ভাড়া আদায় বন্ধ, রেলের বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ বাতিল, যাত্রী সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনে নিঃশুল্ক-পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা, বেলদা-বালিচক-পাঁশকুড়া প্রভৃতি রেলস্টেশনের কাছাকাছি জনবহুল এলাকার রেলগেট-লেভেল ক্রসিংগুলিতে অবিলম্বে ফ্লাইওভার (রোড ওভার ব্রিজ) বা আন্ডারপাস নির্মান, বেলদা-দিঘা ও আরামবাগ-চন্দ্রকোনা রোড-ঘাটাল-পাঁশকুড়া নতুন রেল লাইন স্থাপন, ঝাড়গ্রাম-হলদিয়া, দিঘা-খড়গপুর-হাওড়ার সংযোগকারী ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির দু'দিকে বুকিং কাউন্টার এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফট অথবা এস্কালেটারের ব্যবস্থা, লোকাল ট্রেনে ডিসপ্লে বোর্ডে এবং মাইকে ট্রেনের অবস্থান ও পরবর্তী স্টেশনের নাম নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘোষণা প্রভৃতি। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, মালগাড়ি ও বন্দে ভারত ট্রেনকে আগে নিয়ে যেতে অস্বাভাবিক ভাবে লোকাল ট্রেন দেরি করানো চলছে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবিলম্বে ট্রেন লেট সমস্যার সমাধান না হলে রেলযাত্রীরা বৃহত্তর আন্দোলন নামতে বাধ্য হবে।

উচ্ছেদের প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে কৃষক সমাবেশ

মধ্যপ্রদেশে পার্বতী নদীতে বিশাল বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে সরকার। এই উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ কৃষি ও বসবাসের জমি দখলের উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। এর বিরুদ্ধে 'গ্রাম বাঁচাও খেত বাঁচাও ও বন্ধ চিনি কারখানা চালু করো সংঘর্ষ সমিতি'-র ডাকে ৪ মার্চ মহা-পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হল গুনা জেলার বরসাত এলাকায়। আশপাশের ৩৬টিরও বেশি গ্রাম থেকে হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর মহা-পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বক্তা ছিলেন সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতা এবং এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান। তিনি বলেন, বড় বড় কোম্পানি-মালিকদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিতেই সরকার বাঁধ তৈরির নামে হাজার হাজার গরিব কৃষকের জমি দখল করে তাদের গৃহহীন করার ষড়যন্ত্র করছে।

এর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সংঘর্ষ কমিটি তৈরি করে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানান তিনি। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক মনীষ শ্রীবাস্তব এবং সংঘর্ষ সমিতির অনিরুদ্ধ মীণা, মহেন্দ্র নায়ক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পাঠকের মতামত

‘বেল্ট যেখানেই থাকুক গলায় চিহ্ন থাকবেই’

আসুন, যে মানুষ বিবেক হারিয়েছে, তার জন্য আমরা অনুশোচনা করি! পেট বড় বালাই, কিন্তু তা যদি গোটা বিবেকটাকেই গিলে ফেলে, সে তখন এক মস্ত বিড়ম্বনা। তখন তার মন নেই, অনুভূতি নেই, যুক্তিবোধ নেই, মূল্যবোধ নেই, মানবসভ্যতার যে মহৎ সম্পদ বন্য পশুত্বের উপর মানবতার সুমহান বিজয় পতাকা উড়িয়েছে, সে সম্পদ থেকে সে বঞ্চিত। হতভাগ্য সে মানুষ কেবল পোশাকি মানুষ। পোশাকে সে সভ্য হতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে স্বাধীন নয়। তাই তার ‘বেল্ট যেখানেই থাক গলায় চিহ্ন থাকবেই।’ যুগে যুগে সে চিহ্নকে ঘৃণা করার শিক্ষাই হল আত্মবিক্রয় না করার শিক্ষা। কিন্তু সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষ ক্ষমতার কাছে প্রসাদ পেতে সদা নতজানু। আসুন সে মানুষকে ঘৃণা করি। এই তো মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার নিদারুণ নিষ্ঠুরতা! আমাদের বোনেদের উপর নির্মম অকথ্য অত্যাচার সভ্য মানুষ তাকে স্মরণে রাখবে। যখনই সভ্যতার প্রশ্ন উঠবে আমরা স্মরণ করব কোতোয়ালি থানার কথা। আমরা আলোচনায় নিমগ্ন হব যে সভ্যতা আজও তার কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা অর্জন করেনি, না হলে দাসত্বের এমন নিকৃষ্ট উদযাপন আমরা দেখব কেন? আমার বোনেরা এ দেশের কোটি কোটি মানুষের শিক্ষার অধিকারের দাবিতে জেলবন্দি হয়ে নির্যাতিতা হয়েও যে স্বাধীন মর্যাদাময় পথকে দেখিয়ে দিতে পারল, এতগুলো লকআপের চাবির অধিকার নিয়েও কোতোয়ালি থানার পুলিশ ক্রীতদাসত্ব ছাড়া অন্য কোনও পথ দেখাতে পারল না। ধিক্কার কোতোয়ালি পুলিশকে। অন্যায়ের সাথে থেকে বিবেক বিক্রি করে পেট আপনাদের ভরতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র পেটের সন্তুষ্টি মানুষের মনকে শান্তি দেয় না। সরকারি প্রসাদে প্রমোশন নিয়ে আপনি উচ্চপদে যেতে পারেন, কিন্তু সে উচ্চতা অর্জন মানব জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না, তাই চিরকাল যারা শাসকের হয়ে অত্যাচারের পক্ষে, অন্যায়ের পক্ষে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি আপনাদেরও করবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—

‘পুলিশ একবার যে চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনও কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। ... পুলিশের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাঙঘাতিক। ...উহাদের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে।’

সেদিনের শাসক আজ নেই, শাসক বদলেছে। কিন্তু শাসন বদলায়নি। শোষণ বদলায়নি। শুধু তার চরিত্র বদলেছে। সেই দিনও যারা শাসকের কাছে আত্মবিক্রয় করে বিবেক বন্ধক দিয়েছে, তাদের উত্তরসুরীদের হাতেই কোতোয়ালি থানার লকআপের চাবি। আর সেদিন যারা কারা অন্তরালে মুক্তিকামী মানুষের হয়ে নির্যাতন ভোগ করেছে, তারাই আজ কোতোয়ালি থানায় নির্যাতিতা বোনেদের চোখে-মুখে প্রশান্তিময় হাসিতে বেঁচে আছে। ধন্য আমার বোনেরা।

সুমন দাস
যাদবপুর, কলকাতা

‘সমস্ত লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস’

তিনের পাতার পর

সংকীর্ণ। বুর্জোয়া শ্রেণি এই সংকট কাটিয়ে ওঠে কী ভাবে? একদিকে উৎপাদনশক্তির বিপুল অংশ তারা বাধ্যতামূলক ভাবে ধ্বংস করে ফেলে। অন্য দিকে নতুন বাজার দখল করে আর পুরনো বাজারকে আরও বেশি করে শোষণ করে। অর্থাৎ আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ পরিষ্কার করে দেয় এবং সংকটরোধের উপায় হ্রাস করে।

যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্ততন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছিল সেইসব অস্ত্র এখন তারই বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে।

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি নিজের মৃত্যুর অস্ত্র যে শুধু নিজে বানিয়েছে তা নয়, যে মানুষ এই অস্ত্র চালাবে সেই আধুনিক শ্রমিক শ্রেণিকে— প্রলেতারিয়েতকেও সে সৃষ্টি করেছে।

যে অনুপাতে বুর্জোয়া শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজি বাড়তে থাকে ঠিক সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি। শ্রমজীবী এই মানুষেরা যতক্ষণ কাজ পায় ততক্ষণই শুধু বাঁচতে পারে, আর ততক্ষণই তারা কাজ পায় যতক্ষণ তাদের শ্রমে পুঁজির পরিমাণ বাড়ে।

এই সব শ্রমিকেরা একটু একটু করে খেপে খেপে নিজেদের বেচতে বাধ্য হয়। অন্যান্য বাণিজ্য সামগ্রীর মতোই এরাও একটা পণ্য। কাজেই প্রতিযোগিতার সমস্ত অনিশ্চয়তা এবং বাজারের সমস্ত উত্থানপতনের ধাক্কা এসে পড়ে এদের উপর।

বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব আর আধিপত্যের অবশ্যপ্রয়োজনীয় শর্ত হল পুঁজি সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি। পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ওপর। শিল্পের অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণি না ভেবেচিন্তেই বাড়িয়ে চলে। এই অগ্রগতির ফলে প্রতিযোগিতার কারণে শ্রমিকদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার জায়গায় দেখা দেয় সমিতিতে জোটবদ্ধ হওয়ার দরুন তাদের বিপ্লবী সংহতি। সুতরাং যে বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য ভোগদখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ সেই বনিয়াদটাই তার পায়ের তলা থেকে কেটে ফেলে দিচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণি তাই সর্বোপরি সৃষ্টি করছে তার কবর-খনকদের। বুর্জোয়াদের পতন এবং প্রলেতারিয়েতদের জয়লাভ— দুই-ই সমান অবশ্যম্ভাবী।

প্রলেতারিয়েত এবং কমিউনিস্ট

সমগ্র ভাবে প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক কী?

শ্রমিক শ্রেণির অন্যান্য পার্টির প্রতিপক্ষ হিসেবে কমিউনিস্টরা কোনও পৃথক পার্টি গড়ে না। প্রলেতারিয়েতের সমগ্র স্বার্থের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনও স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারিয়ান আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার এবং গড়ে তোলার জন্য তারা নিজেদের কোনও সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণির অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্টদের তফাৎ শুধু এই—

(১) বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়েতদের জাতীয় সংগ্রামে তারা জাতি-নির্বিশেষে সমস্ত প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেটাকে সামনে তুলে ধরে।

(২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বিকাশ লাভ করতে হয় তাতে তারা সব সময় এবং সর্বত্র আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শিক্ষা

সুতরাং, একদিকে কমিউনিস্টরা বাস্তবে প্রতিটি দেশের শ্রমিক শ্রেণির পার্টিগুলির সবচেয়ে অগ্রসর আর দৃঢ়চেতা অংশ, সেই অংশ যারা অন্য সবাইকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্য দিকে তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের এই সুবিধা রয়েছে যে, প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের অগ্রগতির ধারা, তার শর্ত, তার চূড়ান্ত সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

অন্যান্য সমস্ত প্রলেতারিয়ান পার্টি আর কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য একই— প্রলেতারিয়েতদের একটা শ্রেণি হিসেবে সংগঠিত করা, বুর্জোয়াদের আধিপত্য উচ্ছেদ করা, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা।

কমিউনিস্টদের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলি অমুক-তমুক কোনও ভাবী বিশ্বজোড়া সংস্কারকের দ্বারা কল্পিত বা আবিষ্কৃত কোনও ধ্যানধারণা বা নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি।

যে শ্রেণিসংগ্রাম, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, তা থেকে উদ্ভূত প্রকৃত সম্পর্কই শুধু এই তত্ত্ব সাধারণভাবে প্রকাশ করছে। প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের অবসান ঘটানো মোটেই একমাত্র কমিউনিজমেরই বৈশিষ্ট্য নয়।

ঐতিহাসিক অবস্থার রদবদলের ফলে অতীতের সমস্ত মালিকানা সম্পর্কের ঐতিহাসিক রদবদল ক্রমাগত ঘটেছে।

যেমন ফরাসি বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে।

সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ ঘটানো কমিউনিজমের কোনও বৈশিষ্ট্য নয়। কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্য হল বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদ ঘটানো। কিন্তু শ্রেণি-শত্রুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, স্বল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য ভোগদখলের ব্যবস্থার চূড়ান্ত এবং পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে সংক্ষেপে এই একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা চলে। ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ। ...

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হয় যে তারা দেশ আর জাতিসত্তা বিলোপ করতে চায়।

মেহনতি মানুষের কোনও দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, জাতির মধ্যে পরিচালক শ্রেণি হয়ে উঠতে হবে, নিজেকে জাতি হয়ে উঠতে হবে, সেই হিসেবে তখন সে নিজেই হবে জাতি— যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়। ... যে পরিমাণে একজন ব্যক্তির উপর অন্য একজন ব্যক্তির শোষণ শেষ হবে সেই পরিমাণেই এক জাতির ওপর আর এক জাতির শোষণও শেষ হবে। যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণি-শত্রুতার বিলোপ ঘটবে সেই পরিমাণে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির শত্রুতার বিলোপ ঘটবে।...

কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, এই বিপ্লবের বিকাশের ফলে চিরাচরিত ধ্যানধারণার সঙ্গেও একেবারে আমূল বিচ্ছেদ ঘটে।

কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের আপত্তির প্রসঙ্গ এখানে শেষ করা যাক। উপরে আমরা দেখেছি, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণির পর্যায়ে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে জয়লাভ করা। বুর্জোয়াদের হাত থেকে সমস্ত পুঁজি ক্রমে ক্রমে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য, যত দ্রুতগতিতে সম্ভব সমগ্র উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে কাজে লাগাবে।...

বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়ে যাবে এবং যখন সমস্ত উৎপাদন গোটা জাতির এক বিশাল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে তখন সর্বসাধারণের ক্ষমতার রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণির ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য অন্য শ্রেণির সংগঠিত ক্ষমতা মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে লড়াই চালাবার সময় অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে একটা শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত করে থাকতে বাধ্য হয়, যদি বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েত নিজেকে শাসক শ্রেণিতে পরিণত করে এবং তার ফলে যদি উৎপাদনের পুরনো ব্যবস্থা বলপ্রয়োগে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিশত্রুতার অস্তিত্বের তথা সাধারণ ভাবে সমস্ত শ্রেণির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় অবস্থা তারা ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। আর তার ফলে শ্রেণি হিসাবে নিজের আধিপত্যের তারা অবসান ঘটাবে।

বিভিন্ন শ্রেণি এবং শ্রেণিশত্রুতার অস্তিত্ব সম্বলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এমন একটা সমাজ যেখানে প্রত্যেকের অবাধ বিকাশই হবে সকলের অবাধ বিকাশের শর্ত।... ”

সঙ্কটের গহ্বরে আমেরিকাও ছাঁটাইয়ের কবলে লক্ষাধিক সরকারি কর্মী

নির্বাচনে জিতে ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার মসনদে বসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার ৪ দিনের মধ্যেই ২৪ ফেব্রুয়ারি আমেরিকায় ব্যাপক শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই শুরু হল। ওপিএম এবং ডিওজিই নামের দুটি নবগঠিত সরকারি দফতর থেকে কর্মচারীদের কাছে একটি ই-মেল যায়। তাতে বলা হয়েছিল, দু'দিনের মধ্যে সাপ্তাহিক কাজের রিপোর্ট দিতে না পারলে চাকরি থেকে তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হবে। সরকারের খরচ কমাতেই গণহারে কর্মী ছাঁটাই বলে জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ছাঁটাইয়ের আতঙ্কে সরকারি কর্মচারীরা দিশেহারা। এই ছাঁটাই কর্মসূচিতে যোগ্য সঙ্গত দিতে মাঠে নেমে পড়েছেন সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে নিযুক্ত ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম পরামর্শদাতা, মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক।

সরকারি ওই দুটি সংস্থা ইতিমধ্যেই মার্কিন গোয়েন্দা দফতর এফবিআই সহ অন্যান্য দফতরের কর্মীদের ব্যাপক হারে বরখাস্ত করেছে। কিছু কর্মীকে স্বেচ্ছাবসরের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অনেক শিক্ষানবিশ কর্মীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ইস্তফাপত্র। প্রায় ৩০ হাজার 'প্রবেশনার' সরকারি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রায় ৭৫ হাজার কর্মী সরকারের দেওয়া স্বেচ্ছাবসরের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রায় ২৮০০ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারের ৪৩০০ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ৩৪০০ জন ন্যাশনাল ফরেস্ট সার্ভিসেসের দায়িত্বে ছিলেন, যারা আমেরিকার প্রায় ২৯ কোটি একর জমির দেখভাল করতেন। এ ছাড়া ডিপার্টমেন্ট অব হাউসিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্টের ৫০ শতাংশ কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরি গিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টিরিয়র থেকে ২৩০০ জনের। ন্যাশনাল ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিসেসের প্রায় সব কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগে রাতারাতি বরখাস্ত করা হয়েছে ৮০০ কর্মীকে।

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ বলে পরিচিত আমেরিকার এ অবস্থা কেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন বারে বারে 'বন্ধু' বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলা জড়িয়ে ধরছেন, সে দেশের অর্থনীতিকে 'মডেল' করে ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দেশের মানুষকে, তখন সেখানেই লক্ষ লক্ষ কর্মীকে রাতারাতি ছাঁটাই হতে হচ্ছে কেন? আমেরিকায় রয়েছে কাজের নিরাপত্তা, ভাল বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা— এক কথায় নিশ্চিত জীবনের হাতছানি, এ দেশের মানুষ এমন শুনতেই অভ্যস্ত। আমেরিকায় বেকার সমস্যা নেই বলে দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যমগুলিও দিনরাত কোরাস গেয়ে চলে। সেই আমেরিকার এই হাঁড়ির হাল কেন?

বাস্তবে আমেরিকাও আভ্যন্তরীণ বাজার সংকটে জর্জরিত। পুঁজিবাদী তীব্র শোষণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নামছে। আমেরিকার সাধারণ মানুষের ভয়াবহ অবস্থাটা করোনা পরিস্থিতি গোটা বিশ্বের সামনে বেআব্রু করে দিয়েছে। চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন হাজারে হাজারে। আভ্যন্তরীণ বাজার সংকট আমেরিকান অর্থনীতিকে সামরিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। এখন বিশ্ববাজারেও তার একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাটা পড়ছে। রাশিয়া, চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো শক্তিগুলি বিশ্ববাজারে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। তা ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকার বিপুল ব্যয় ও ইজরায়েলকে অস্ত্র সাহায্য দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থিক সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলেছে। মার্কিন অস্ত্র কোম্পানিগুলি এর দ্বারা বিপুল মুনাফা করলেও রাজকোষ ফাঁকা হয়ে গেছে। আর তার মূল্য চোকাতে হচ্ছে সাধারণ মার্কিন জনগণকে।

সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ নীতিতে প্রথম কোপ পড়েছে সরকারি কর্মীদের ঘাড়ে। এই কর্মীরা কি কখনও ভেবেছিল তাঁদের এ ভাবে ছাঁটাই হতে হবে? স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে? তারা সরকারি নিয়ম-নীতি মেনেই শ্রম দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই আজ তারা বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যত ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে, তত সামরিক শক্তির উপর তার নির্ভরশীলতা বাড়ছে, তত সে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, তত সে মারমুখী হচ্ছে, তত সে নিষ্ঠুর হচ্ছে, তত সে বর্বর হচ্ছে। এ ভাবেই সে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের পায়ে জনগণের স্বার্থকে বলি দিচ্ছে। এই শ্রমিক-কর্মচারীদের সামনে এখন করণীয় কী? দুটি পথ খোলা। জরুরিভিত্তিক প্রয়োজন হল আইনের দ্বারস্থ হওয়া। বেশ কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সানফ্রান্সিসকোর আদালতে মামলা করলে বিচারক বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও আইনই ওপিএম-কে সরকারি দপ্তরের কর্মী ছাঁটাইয়ের ক্ষমতা দেয়নি। যদিও ইতিমধ্যেই ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কর্মীরা কী করবেন সে বিষয়ে আদালত কিছু বলেনি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপরিকাঠামো হিসাবে আদালত এর বেশি কিছু বলতে পারে না। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা। তা হলে ছাঁটাই শ্রমিকদের সামনে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা থাকল না।

আমেরিকায় ব্যাপক হারে ছাঁটাই দেখিয়ে দিল পুঁজিবাদী সংকট এত তীব্র যে, ভারত তো দূরের কথা, বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আমেরিকারও তার হাত থেকে রেহাই নেই।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট ● ব্লক-৪ ● স্টল নং - ১৫

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বনগাঁ সাংগঠনিক কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড রণজিৎ বৈরাগী ৩ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার বহু মানুষ, কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পতিত পাবন মণ্ডল, শিবানী হালদার ও সুকুমার চক্রবর্তী প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড রণজিৎ বৈরাগী আটের দশকে ছাত্রাবস্থায় ভাষা শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে বনগাঁতে পার্টির কর্মী হিসেবে নিজেকে উন্নীত করেন। তখন বনগাঁতে কোনও দলীয় কার্যালয় ছিল না। কমরেড বৈরাগীর বাড়িই দলীয় কার্যালয়ের মতো ব্যবহৃত হত। তিনি দলের নেতা-কর্মীদের অত্যন্ত আপনজন মনে করতেন। তিনি পরিবারকেও দলের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেন। বনগাঁতে দলের সংগঠন গড়ে তোলার সূচনা পর্বে তাঁর ও তাঁর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দরিদ্র

মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল অসীম। পার্টির প্রয়োজনে তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতেন। বনগাঁ শহরে বিশেষ করে রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি বনগাঁতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি প্রয়াত কমরেডের গুণাবলির নানা দিক তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন কমরেড অরুণ বৈরাগী ও কমরেড সাধন দাস। সভাপতিত্ব করেন কমরেড শিবদাস হালদার। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ সহ জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্য ও কর্মীরা। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড রণজিৎ বৈরাগী লাল সেলাম

দাম না পেয়ে সংকটে আলু চাষিরা

৬ মার্চ কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি, অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন, কৃষক ঐক্য মঞ্চ, কৃষক কল্যাণ সমিতির ডাকে যৌথভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলা শহরের কার্জন গেট চত্বরে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা।

জেলাশাসককে ছ'দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চাষিরা দাবি করেন, এখন আলু ওঠার সময়ে চাষিরা আলুর দাম পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা চরম বিপাকে। সরকার ৯ টাকা কেজি দরে আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু আলুর উৎপাদন খরচ তার থেকে অনেক বেশি। বিঘা প্রতি ৩৮ হাজার টাকা। সার, বীজ, কীটনাশকের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। চলছে ব্যাপক কালোবাজারি। ২৮০০ টাকা দামের বীজ কিনতে হয়েছে ৩২০০-৩৫০০ টাকায়। সার বস্তা পিছু ২০০ থেকে ৫০০ টাকা বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। অন্যান্য খরচ ধরে বিঘা প্রতি খরচ ৫০ হাজার টাকার বেশি। এক কুইন্টাল আলুর উৎপাদন খরচ কমপক্ষে ১২৫০ টাকা। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে কুইন্টাল প্রতি আলুর এমএসপি হয় ১৮৭৫ টাকা। রাজ্য সরকার আলুর দাম ঘোষণা করেছেন ৯০০ টাকা কুইন্টাল। যা উৎপাদন খরচের থেকে ৩৫০ টাকা কম। ফলে আলু চাষিরা ব্যাপক ভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। কৃষকদের দাবি, সরকারকে ন্যায্য দামে আলু কিনতে হবে। সারে কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। ২০২৩-'২৪ সালে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের বকেয়া বিমার টাকা ১০০ শতাংশ দিতে হবে এবং সম্প্রতি বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, উৎপল রায়, মোজাম্মেল হক, সদানন্দ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দাবি

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে ৪ মার্চ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দর মোদি ও জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাতিলের দফতরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিটির উপদেষ্টা মধুসূদন মান্না, সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সদস্য সুনীল গোস্বামী, প্রসেনজিৎ কাপাস, অর্ধেন্দু মাজী।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 31 Bengali Weekly March 14, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। ৫ মার্চ

মেদিনীপুরে আইসির শাস্তির দাবি

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় ছাত্রী-কর্মীদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচারে দোষী আইসি ও পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবিতে ৮-১৩ মার্চ দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সপ্তাহের ডাক দেওয়া হয়। জেলায় জেলায় অসংখ্য স্থানে প্রতিবাদ সভা, ধিক্কার মিছিল হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ। (নিচে) মালদহ

সিপিডিআরএস-এর নিন্দা

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ৫ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মঘট করা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। এ বিষয়ে আইন বিভাগ ও বিচারবিভাগের স্পষ্ট নির্দেশিকা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় পুলিশ লঙ্ঘন করেছে। ছাত্রীদের উপরে নির্যাতনের জন্য মহিলা থানার আইসিকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

মেদিনীপুরে নাগরিক কনভেনশন

১০ মার্চ মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হলে 'সিটিজেন্স ফর জাস্টিস'-এর উদ্যোগে নাগরিক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ডব্লিউবিজেডিএফ নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো, ডাঃ আশফাকুল্লা নাইয়া, এআইজেএসি জেলা সম্পাদক বঙ্কিম মুর্মু প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী।

আর জি কর হাসপাতালে গণকনভেনশন

অভয়ার অবিচারের সাত মাসে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম ও নার্সেস ইউনিটির যৌথ উদ্যোগে ৯ মার্চ আর জি কর মেডিকেল কলেজের ঐতিহাসিক আন্দোলন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এক গণকনভেনশন।

কনভেনশন থেকে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, 'যতদিন না ন্যায়বিচার আমরা পাচ্ছি ততদিন জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাব। সিবিআইকে অবিলম্বে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে হবে। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের প্রশাসনের অন্যায় ভাবে হেনস্তা ও ফাঁসানো বন্ধকরতে হবে। শুধু কলকাতায় নয়, আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে রাজ্যের প্রতিটি শহরে, গ্রামে ও জেলায় জেলায়। সর্বোচ্চ আদালতকে অভয়ার মা-বাবার ও জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের বক্তব্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় আনতে হবে, যাতে অবিলম্বে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়।'

বক্তব্য রাখেন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, নার্সেস ইউনিটির যুগ্ম সম্পাদক বিভা চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

কনভেনশনে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডাঃ অনিকেত মাহাতো ও ডাঃ আশফাকুল্লা নাইয়া। অনিকেত মাহাতো আন্দোলনকে তীব্র করার কথা ঘোষণা করে বলেন, আন্দোলনে সাধারণ মানুষ আমাদের তহবিলে যে সাহায্য করেছেন, অডিট ফার্মকে দিয়ে অডিট করিয়ে তার পাই-পয়সা হিসেব আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই জনসমক্ষে প্রকাশ করব। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন বাকি খুনিদের এবং খুনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্তদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে তো? স্যালাইন কাণ্ডে আসল দোষীদের ধরবে তো? কনভেনশন থেকে প্রস্তাব নেওয়া হয়, ডাক্তার, নার্স, রোগীর পরিবার এবং সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে আন্দোলনকে তীব্র করা হবে, অবিলম্বে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের দাবিকে জোরদার করা হবে এবং মেডিকেল কলেজগুলি সহ সর্বত্র থ্রেট কালচার সম্পূর্ণ বন্ধের দাবি তীব্র করা হবে।

প্রকাশিত হয়েছে

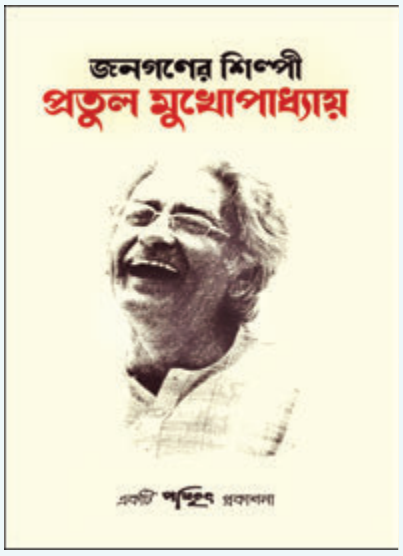

সংগ্রহ করুন

মহিলাদের উপর অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সভা সল্টলেকে

এআইএমএসএস বিধাননগর ইউনিটের উদ্যোগে সল্টলেকের আইপিএইচ হলে অভয়ার ন্যায়বিচার, নারীদের উপর ঘটে চলা অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৯ মার্চ। সভায় সল্টলেকের বহু বিশিষ্ট নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের আনথ্রোপোলজি বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা মিতা চক্রবর্তী। শুরুতে মেদিনীপুরে কোতোয়ালি থানায় চারজন ছাত্রীর উপর বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাঠ করেন সত্যবতী জানা। বক্তব্য রাখেন এমএসএস-এর কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য সীমা দে। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য, এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত ও বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com